গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৮ সংখ্যা | ১৬ - ২২ সেপ্টেম্বর ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

জন্মশতবর্ষে

কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষা

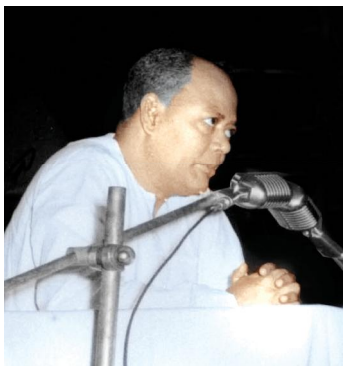

‘‘এই যে জনসাধারণ বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির প্রভাবে টুকরো টুকরো হয়ে রয়েছে এবং বিশেষত যারা বিপ্লবী ছদ্মবেশ ধরে আছে, যাদের বেস পলিটিক্যাল লাইন বিপ্লবী নয়, দলের রাজনৈতিক চরিত্র বিপ্লবী নয়; যে বিশ্লেষণে আপনারা বুঝেছেন যে আলটিমেটলি তারা পিপলকে বিপ্লবে নিয়ে যেতে চায় না;পিপলের মধ্যে যে আউটবার্স্টটা আসে, লড়াইয়ের ফারভারটা আসে সেটাকে তারা ডাইভার্ট করে ইলেকশনে ফায়দা তুলতে চায়। প্রথম দিকে এইরকম ফোর্সগুলোর প্রভাব থাকে পিপলের কনসাসনেস না থাকার জন্য। সেইজন্য স্ট্যালিনের একটা বিখ্যাত উক্তি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি বলছেন— টু পুট অ্যান এন্ড টু ক্যাপিটালিজম, ইট ইজ নেসেসারি টু পুট অ্যান এন্ড টু সোস্যাল ডেমোক্রেটিজম। এ কথা কেন বলছেন? সোসাল ডেমোক্রেটিজমের কথা বলছেন কেন? ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেতনাটা মাসের মধ্যে যখন আসতে থাকে, যারা প্রো-ক্যাপিটালিস্ট পার্টি তাদের সম্পর্কে জনসাধারণের মোহ কাটাতে বেশি সময় লাগে না। বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলেও সেটা কাটাতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু সবচেয়ে বিপদ হচ্ছে যারা অ্যান্টি ক্যাপিটালিস্ট বলে পোজ করে, লাল ঝান্ডা ওড়ায়, সোসাল ডেমোক্রেসির কথা বলে, কমিউনিজমের কথা বলে, ক্লাস স্ট্রাগলের কথা বলে, মজুরের কথা বলে, মালিকের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়; যেগুলো ফোর্স অফ কমপ্রোমাইজ, সুডো রেভলিউশনারি

তিনের পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীজি, নেতাজির পথে চলা আপনার কর্ম নয়

ইন্ডিয়া গেটের সামনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, গত আট বছরে তাঁর সরকার যে সমস্ত কাজ করেছে, যে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে নেতাজির আদর্শ, স্বপ্নের ছাপ রয়েছে। বলেছেন, নেতাজির ভাবনার পথে চললে ভারত অনেক উঁচুতে পৌঁছতে পারত। তিনি এখন সেই পথেই চলেছেন বলে জানিয়েছেন মোদি।

বক্তার অতীত এবং বর্তমান কার্যকলাপ সম্পর্কে পরিচিতি না থাকলে কারও মনে হতে পারে, দেশে বোধহয় নেতাজির কোনও বড় অনুগামীর আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর কার্যকলাপ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এ-সবই যে প্রধানমন্ত্রীর বাগাড়ম্বর, একজন আপসহীন, আদর্শবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে দেশের মানুষের মনে যে গভীর আবেগ রয়েছে, তা আত্মসাৎ করার হীন প্রচেষ্টা ছাড়া এ যে আর কিছু নয়, তা বুঝতে তাঁদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন— কেন, প্রধানমন্ত্রী কি নেতাজির ভাবনার পথে চলতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। কিন্তু যাঁর এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে, তিনিই বলবেন, প্রধানমন্ত্রী যে পথে চলেছেন, তা নেতাজির পথ তো নয়-ই, বরং তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিপরীত পথে চলাটাই, নরেন্দ্র মোদি যে দলের নেতা, যে দলের সরকারের প্রধান হয়ে তিনি দেশ চালাচ্ছেন, সেই বিজেপির রাজনীতি। নিজেকে যে আরএসএসের সেবক বলতে তিনি গর্ববোধ করেন সেই আরএসএসেরও রাজনীতি।

প্রধানমন্ত্রীর দল বিজেপির পূর্বসূরি যে জনসংঘ, তার প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ছিলেন হিন্দু মহাসভার নেতা।

ছয়ের পাতায় দেখুন

মহানগরীর রাজপথে যুব বিক্ষোভের ঢেউ

এসএসসি ও টেট পাশ সমস্ত প্রার্থীর চাকরি, দুর্নীতিগ্রস্তদের শাস্তি সহ ১০ দফা দাবিতে কলকাতায় কলেজ স্ট্রিট থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত এআইডিওয়াইও-র ডাকে বিক্ষোভ মিছিল। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি নিরঞ্জন নস্কর, রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী ও রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল প্রমুখ। ৯ সেপ্টেম্বর

বাগুইআটিতে ছাত্র খুন

অপদার্থ কর্তাদের শাস্তি হবে না কেন?

কলকাতায় বাগুইআটি এলাকার দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যু রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনের চূড়ান্ত অপদার্থ চেহারা নগ্ন করে দিয়ে গেল। ২২ আগস্ট দশম শ্রেণির দুই ছাত্র অতনু দে এবং অভিষেক নস্কর নিখোঁজ হন। উদ্বিগ্ন পরিজনরা বাগুইআটি থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ বিষয়টিকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। ছেলেদুটিকে খোঁজার কাজ শুরু করার বদলে থানার আধিকারিকরা, ছেলে দিঘায় গিয়ে ফূর্তি করছে কিনা তা খোঁজ করার পরামর্শ দিয়েছেন বাবা-মাকে।

পুলিশের এই চরম অসংবেদনশীল মনোভাব দেখে অসহায় পরিজনরা কলকাতা পুলিশের হেডকোয়ার্টার লালবাজার এবং রাজ্যের গোয়েন্দা বাহিনীর সদর দফতর ভবানী ভবনে দেখা করে সাহায্যের আবেদন জানান। কিন্তু সেখানেও বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি। স্থানীয় কাউন্সিলর থেকে স্থানীয় বিধায়ক, এ দফতর থেকে সে দফতর— পাগলের মতো ছুটে বেড়িয়েছেন নিখোঁজ ছেলেদুটির বাবা-মায়েরা। সন্দেহভাজন অপরাধী, যে তাঁদের প্রতিবেশী, তার নামও জানিয়েছেন। পুলিশ নড়ে বসেনি। মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসার কথা পুলিশকে জানানো হলে অবশেষে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে খুন হয়ে যাওয়া দুই কিশোরের মৃতদেহ দু'সপ্তাহ ধরে সরকারি হাসপাতালের মর্গে পড়ে থেকেছে। সেগুলি ওই নিখোঁজ কিশোরদেরই দেহ কিনা, তা

দুয়ের পাতায় দেখুন

‘পিএম শ্রী’ ঃ পিছনের দরজা দিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি চালুর ফন্দি

নানা কিসিমের নির্দেশাবলি জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চশিক্ষায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ চালু করার প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত আছে। ইউজিসি, এআইসিটিই প্রভৃতি উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় নিয়ামক সংস্থার মাধ্যমেই একাজ চলছে। কিন্তু বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন কোনও কেন্দ্রীয় নিয়ামক সংস্থা তাদের হাতে নেই, যা দিয়ে সরাসরি তারা হস্তক্ষেপ করতে পারে। ফলে তারা নতুন ফন্দি এঁটেছে। ‘পিএম শ্রী’ নামে একটি নতুন প্রস্তাব তারা রাজ্যগুলোকে দিয়েছে। প্রস্তাবটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল—দেশের ১৪,৫০০ স্কুলকে তারা মডেল স্কুলের পর্যায়ে উন্নীত করবে, রাজ্যগুলির সঙ্গে পরামর্শ করেই তা করবে এবং তার জন্য ২৭,৩৬০ কোটি টাকা খরচ হবে। এই অর্থের ৬০ শতাংশ-র দায়ভার কেন্দ্রের, বাকি ৪০ শতাংশ রাজ্যের। স্কিম চালু হওয়ার প্রথম

দুয়ের পাতায় দেখুন

‘পিএম শ্রী’

একের পাতার পর

৫ বছর কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে, তারপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাজ্যের। প্রত্যেকটি ব্লকে অন্তত ২টি করে এমন স্কুল হবে। এই স্কুলগুলিতে ‘স্মার্ট’ শ্রেণিকক্ষ থাকবে, ডিজিটাল লাইব্রেরি থাকবে, উন্নত শিক্ষণ পদ্ধতি থাকবে ইত্যাদি অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ১৮ লক্ষ পড়ুয়া ভর্তির সুযোগ পাবে, কেন্দ্রীয় আর্থিক অনুদান সরাসরি স্কুলে পৌঁছাবে। কিন্তু ঝুলি থেকে বেড়াল তখনই বেরিয়ে পড়েছে, যখন বলা হয়েছে সেই রাজ্যগুলিতে তারা এই প্রকল্প চালু করবে যারা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ পুরোপুরি ভাবে চালু করার সম্মতি জানাবে। অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলোকে আর্থিক প্রলোভন দেখাচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এতবড় নির্লজ্জতা এর আগে দেখা যায়নি।

কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশের শিক্ষক-শিক্ষাবিদ-ছাত্র-অভিভাবক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের শিক্ষাপ্রেমী জনসাধারণের মতামত পদদলিত করে যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ কার্যকর করছে তা সরকারের একের পর এক পদক্ষেপ থেকে পরিষ্কার। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতরের দুইটি ঘোষণা এই বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করেছে। সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বহুমুখী (মাল্টিডিসিপ্লিনারি) শিক্ষালয়ে পরিণত করার উদ্দেশ্যে একটি গাইডলাইন প্রকাশ করেছে। গাইডলাইনটিতে যা আছে তা হল— ১) উচ্চশিক্ষার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে— (ক) বহুমুখী গবেষণা ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়, (খ) বহুমুখী শিক্ষণ ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়, (গ) ডিগ্রি প্রদানকারী স্বশাসিত বহুমুখী কলেজ। অর্থাৎ দ্বিতীয়ত ও তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণার সযোগ থাকছে না। বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে গবেষণার সুযোগ না থাকলে তা জ্ঞানের বিকাশের পরিপূরক হয় না। স্বভাবতই গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির কৌলিন্য ও বাজার মূল্য বেশি হবে। ফলে উচ্চশিক্ষায় তিন ধরনের নাগরিক তৈরি হবে এবং তাতে বৈষম্য বাড়বে। তা কখনওই কাম্য হতে পারে না।

২) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির হার (জিইআর) ২০৩৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ করার লক্ষ্যে অনলাইন ও দূরশিক্ষায় (ওডিএল) ভর্তির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ভর্তির হার হয়ত বেশি দেখানো যাবে, কিন্তু তাতে প্রকৃত শিক্ষালাভ সম্ভব হবে না।

৩) গুচ্ছ কলেজ (ক্লাস্টার অফ কলেজ) তৈরির নামে অনেকগুলো কলেজকে মিলিয়ে দিতে চাইছে। তার মাধ্যমে সরকার গুচ্ছ কলেজগুলির পরিকাঠামোকে একটি কলেজের পরিকাঠামো হিসাবে দেখাতে চাইবে। তাতে কলেজের পরিকাঠামো বৃদ্ধির দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে না। এই পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় সরকারের শঠতারই প্রকাশ।

৪) অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিট (এবিসি) চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে একজন শিক্ষার্থী একটি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়ার পর ছেড়ে দিয়ে আবার অন্য একটি উচ্চশিক্ষালয়ে ভর্তি হতে পারবে। এইভাবে বহু বার ভর্তি হবে, আবার ছেড়ে দেবে। এমন করে বহু বছর ধরে অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ে একটু একটু করে ক্রেডিট সংগ্রহ করবে। সেই ক্রেডিট ‘ব্যাঙ্কে’(!) জমা হয়ে থাকবে। মোট ক্রেডিট নিয়ে সেই ছাত্র ডিগ্রি অর্জন করবে। এর ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন হাস্যকর পর্যায়ে পৌঁছাবে এবং আসলে ডিগ্রির অবমূল্যায়ন হবে।

সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর পিএম শ্রী স্কুল ও তথাকথিত বহুমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে বলেছেন, বহুমুখী শিক্ষার নামে কেন্দ্রীয় সরকার পদার্থবিদ্যার সঙ্গে ফ্যাশান ডিজাইন বা রসায়নবিদ্যার সঙ্গে অর্থনীতি পড়ার ব্যবস্থা করবে যা সম্যক জ্ঞান গড়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। তিনি আরও বলেন, দেশে প্রধানমন্ত্রীর নামে স্কুল-প্রকল্প চালু করার কোনও নজির নেই। এই সব স্কুলের শিক্ষণ পদ্ধতি পরীক্ষামূলক করার নামে শিক্ষার গৈরিকীকরণ থেকে শুরু করে, ইতিহাস বিকৃতি, বিজ্ঞানের বিকৃতি প্রভৃতি চর্চার আশঙ্কা থাকবে। তিনি এই দুই প্রস্তাব এবং তার সাথে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ সার্বিকভাবে বাতিল করার দাবি জানান।

জীবনাবসান

দলের ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার রাধাকান্তপুর ২ নং আঞ্চলিক কমিটির কর্মী কমরেড নিমাই গায়েন ১৫ জুলাই ভোরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

কমরেড নিমাই গায়েনের বাবা প্রয়াত কমরেড তারাপদ গায়েন ৬০-এর দশকে তেভাগা আন্দোলনের সময়ে এস ইউ সি আই (সি)-র সঙ্গে যুক্ত হন। সেই সূত্রেই কমরেড নিমাই গায়েন দলের রাজনীতি ও উন্নত সংস্কৃতির দ্বারা আকৃষ্ট হন। ’৯০-এর দশকে দলের আবেদনকারী সদস্য ও ধীরে ধীরে সেল ইনচার্জ হিসাবে নিজেকে দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে তোলেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের মনোনীত প্রার্থীকে জেতানোর জন্য তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। দলের সমস্ত কর্মসূচিতে নিজে অংশগ্রহণ করতেন ও অন্যদের যুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। দলের বাংলা মুখপত্র গণদাবীর গ্রাহক সংগ্রহের কাজও তিনি গুরুত্ব দিয়ে করতেন। সংসারে অভাব থাকা সত্ত্বেও দলের কাজে তা কোনও দিন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। পুত্র ও পুত্রবধূকে তিনি দলের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন ও সফল হয়েছেন।

কমরেড গায়েনের মরদেহ বাড়িতে পৌঁছলে দলের কর্মী-সমর্থক-দরদি ও অন্যান্য দলের লোকজন মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন দলের ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও এআইকেকেএমএস-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গুণসিন্ধু হালদার ও কমরেড রেণুপদ হালদার। কমরেড নিমাই গায়েনের মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড নিমাই গায়েন লাল সেলাম

কৃষক-খেতমজুরদের সম্মেলন

অল ইন্ডিয়া কিসান ও খেতমজদুর সংগঠন এ আই কে কে এম এস-এর পাঁশকুড়া ব্লক কমিটির উদ্যোগে সার, বীজ, কীটনাশক, বিদ্যুৎ সহ চাষের সমস্ত রকম উপকরণের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ও ধান-পাট-ফুল সহ কৃষিজ ফসলের লাভজনক দাম সুনিশ্চিত এবং স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধের দাবিতে ২৮ আগস্ট পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার প্রতাপপুর বুনিয়াদী প্রাথমিক স্কুলে পাঁশকুড়া ব্লক দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সভাপতি উৎপল প্রধান, সহ সভাপতি বিবেক রায়, কোষাধ্যক্ষ প্রবীর প্রধান। সম্মেলন থেকে রবীন্দ্রনাথ ধাড়াকে সভাপতি, সমরেশ মাইতিকে সম্পাদক করে কমিটি গঠিত হয়। এই উপলক্ষে পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে প্রতাপপুর পর্যন্ত একটি দৃপ্ত মিছিল পথ পরিক্রমা করে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বলেন, দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে কৃষক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনে সর্বস্তরের কৃষকদের সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সভা

বঞ্চনার বিরুদ্ধে শিক্ষক দিবসে সোচ্চার হলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরাও। ডি এ না দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। খুবই সঙ্কটজনক অবস্থা। কেউ কেউ আত্মহত্যাও করছেন। এর প্রতিবাদে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে ত্রিপুরা হিতসাধনী হলে আয়োজিত সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ।

অবসরপ্রাপ্তদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি সাম্প্রতিক কালে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি বন্ধ করে স্বচ্ছভাবে শিক্ষক নিয়োগ ও জনবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবি জানানো হয়। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সমিতির রাজ্য সম্পাদক কার্তিক সাহা। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন সুনীল ঘোষ, তিনকড়ি মণ্ডল, বাণী পাত্র, তপতী মিত্র, সুধামাধব সামন্ত, রঞ্জিত বাঁকুড়া প্রমুখ। শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি পাঠানো হয়।

বাগুইআটিতে ছাত্র খুন

একের পাতার পর

দেখারও প্রয়োজন বোধ করেনি পুলিশ। শেষ পর্যন্ত দু’সপ্তাহ আগে খুন হয়ে যাওয়া ছেলেদুটির বিকৃত দেহ শনাক্ত করার সুযোগ পান পরিজনরা।

এই ঘটনায় রাজ্য জুড়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন মানুষ। তাঁদের প্রশ্ন— এই মর্মান্তিক মৃত্যু কি অনিবার্য ছিল? রাজ্য পুলিশ-প্রশাসন যদি কর্তব্য পালনে সামান্য তৎপর হত, তাহলে দুটি কিশোরের তরতাজা প্রাণ এইভাবে ঝরে যেত কি? কাউন্সিলর কিংবা বিধায়ক উদ্যোগী হয়ে পুলিশকে যদি তার কাজ করতে বাধ্য করতেন, তাহলে হয়ত এ ঘটনা এড়ানো যেত। কিন্তু তাঁরা কেউই তা করলেন না! মানুষ প্রশ্ন তুলছে, রাজ্যের মানুষকে জীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তাটুকুও যদি পুলিশ-প্রশাসন না দিতে পারে, তাহলে তাদের পিছনে জনগণের কষ্টার্জিত বিপুল টাকা ব্যয় করার যৌক্তিকতা কোথায়? রাজ্যের পুলিশমন্ত্রকের দায়িত্ব রয়েছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর কাঁধে। এই ঘটনায় তাঁর দায় তিনি অস্বীকার করতে পারেন কি? বাগুইআটির ঘটনায় রাজ্য জুড়ে শোরগোল উঠে যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে ওই থানার আইসি-কে সাসপেন্ড করার নিদান দিয়েছেন। মুখ্যসচিব আরও তৎপরতা দেখিয়ে আইসি ছাড়াও তদন্তকারী অফিসারকেও সাসপেন্ড করেছেন। তাঁদের এই তৎপরতা এতদিন কোথায় ছিল? পুলিশ দফতরের এ হেন বেহাল দশার কোনও খবরই কি এতদিন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছিল না? তা হলে দফতরের মন্ত্রী হয়ে কোন দায়িত্বটা তিনি পালন করছেন!

থানাগুলির সঙ্গে শাসক দলের ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি ভুক্তভোগী মানুষ মাত্রেই জানেন। কংগ্রেস আমল থেকে শুরু হয়ে সিপিএম আমল পার করে বর্তমান তৃণমূল জমানাতেও সেই চরিত্রের বদল ঘটেনি। পুলিশ অপরাধীদের গ্রেফতারের ক্ষেত্রে দলীয় রঙ এবং অভিযোগকারীর সামাজিক প্রতিপত্তির ওজন দেখে পা ফেলে। ফলে শাসক দলের অফিস থেকে সঙ্কেত না গেলে বহু ক্ষেত্রেই থানা গুরুতর অভিযোগ পেয়েও নড়ে বসে না। প্রশ্ন উঠছে, বাগুইআটির ঘটনাতেও এ জিনিস ঘটেনি তো!

এ তো গেল প্রশাসনিক দিক। এর চেয়েও গভীর উদ্বেগের দিকটি হল, একজন প্রতিবেশী যুবক দুটি কিশোরকে এমন নৃশংস ভাবে খুন করতে পারল কী করে। সামান্য কিছু টাকার জন্য এভাবে খুন করার মনোবৃত্তি গড়ে উঠল কী করে? খুনি তো অপরাধী হয়ে জন্মায়নি! তার এমন অপরাধপ্রবণ মনটি তৈরি হয়েছে এই সমাজ থেকেই। নৈতিকভাবে অধঃপতিত সংকটগ্রস্ত এই সমাজই আজ মানুষকে অনৈতিক পথে রোজগারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সেই কারণেই টাকার জন্য খুন, টাকার জন্য অপহরণ, নারীপাচার, ড্রাগের কারবার অবাধে চলে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ক্ষমতালোভী ভোটবাজ রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা। ক্ষমতালোভী দলগুলি ভোটের স্বার্থে টাকার বিনিময়ে দরিদ্র যুবকদের দিয়ে ভোট লুঠ করায়, বুথ দখল করে বিরোধীদের উপর হামলা চালায়। এই যুবকদের নৈতিকতার পাঠ কে দেবে? তাদের সামনে নতুন জীবনবোধ তুলে ধরার দায়িত্ব নেবে কারা? নাকি, সমাজটাকে এভাবেই ঘাতকদের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হতে দেব আমরা! বাগুইআটির দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যু এই প্রশ্নটি তুলে দিয়ে গেল।

কমিউনিস্টদের কাছে সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কর্তব্য হল বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলা

একের পাতার পর

সোসাল ডেমোক্রেটিক ফোর্স, তাদের ডিফিট করতে না পারলে বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়ে যেতে পারবে না। এই ফোর্সদের সম্পর্কে মোহমুক্তি না ঘটলে, এদের নেতৃত্বের প্রভাবের বাইরে মাসকে না নিয়ে আসতে পারলে, শ্রমিক-মজুরের রিয়েল পলিটিক্যাল পাওয়ার এবং কারেক্ট রেভলিউশনারি পার্টি গড়তে না পারলে যে বিপ্লব হবে না— এই কথাটা বোঝাতে না পারলে রেভলিউশন হয় না। সেইজন্য বলছে যতক্ষণ পর্যন্ত ইউ ক্যানট গিভ ডিফিট টু অল শেডস অফ সোস্যাল ডেমোক্রেটিজম, মিনিং সুডো রেভলিউশনিজম, ততক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লবকে ফাইনালি জয়যুক্ত করা, কারেক্ট পলিটিক্যাল পার্টির লিডারশিপ এসট্যাবলিশ করা ইজ আনসায়েন্টিফিক ওয়ে অফ থিংকিং। আপনি কাজ করলেই হয় না। আপনার কাজের মধ্যে টার্ন অ্যান্ড টুইস্ট থাকে, সাকসেস এবং ফেলিওর থাকে। সংগ্রাম করা মানে তো আমরা সবসময় মাসের প্রবলেম সলভ করে দিতে পারি না। লড়াইগুলোতে কি আমরা সবসময় জিতি? না, বরং উল্টো হয়। বিপ্লবী দলের ওপর আক্রমণ মারাত্মক হয়। সেই আক্রমণের মুখে প্রথম প্রথম তাদের ফেলিওর হয়, কিন্তু বিপ্লবী দলের কর্মীরা এই ফেলিওরের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে, মাস ডিফারেনসিয়েট করে আন্দোলনের মধ্যে কে কীভাবে লড়ছে, কার স্লোগান কী রকম, কোন দলের কর্মীদের হালচাল কী রকম, এর প্রভাব পড়ে। তাৎক্ষণিক এর ফল না পেলেও, মনে রাখবেন এর মধ্য দিয়ে আপনার শক্তি বাড়ে, ক্ষমতা বাড়ে।

আপনাদের আর একটা কথা এখন বলতে চাই। আমাদের দলটা শুরু থেকে একটা বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে আসছে, সেটা হচ্ছে, বিল্ডিং আপ অফ রেভলিউশনারি ক্যারেক্টার। কমিউনিস্টদের কাছে সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কর্তব্য হল বিপ্লবী চরিত্র বিল্ড আপ করা। কারণ আমাদের দল গঠনের যা ভিত্তি, যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই নতুন দলটির অভ্যুত্থান; বিশেষ করে এ দেশে এই দলটা গড়তে গিয়ে আমরা কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। তখন যে মানুষ অনেস্টি ও ফাইট করার আকাঙ্খা নিয়ে, যাকে সাধারণ মানুষের অর্থে বা বুর্জোয়া অর্থেও ত্যাগ স্বীকার বলি, অর্থাৎ বিপ্লবের জন্য, আদর্শের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা, সেইরকম প্রথম অবস্থায় ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ার পিছনে বা সিপিআই দল গড়ার পিছনে বহু কর্মীর বহু অবদান ছিল। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর আরসিপিআই গড়ার চেষ্টা করেছেন, তাঁর পিছনেও অনেক ভাল ছেলের, ভাল ভাল লোকের ঐ অর্থে যাকে আত্মত্যাগ এবং অবদান বলি সে সব যথেষ্ট ছিল। এমএন রায়ের মতো মানুষ, জ্ঞানে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে সেই যুগে ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর সমকক্ষ আমি কাউকে দেখতে পাইনি। বাকি সব তো পিগমি। যারা এখন রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা কংগ্রেসই হোন বা বামপন্থীই হোন, অন্য যেকোনও দলেরই হোক সকলেই সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত(!)। লোক ক্ষেপানো আর চালাকির কথা বলা ছাড়া আর তারা কী করছে? হ্যাঁ, করছে কী ভাবে কায়দা করে, ডিপ্লোমেসি, চালাকি আর চটুলতা করে চলা যায়। যেগুলোকে আমরা দুষ্ট রাজনীতি বলি। তাদের জ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি, উইসডম বা কোনও শাস্ত্র সম্বন্ধে ধারণা তথৈবচ, একদম নেই বললেই চলে। কিন্তু পুরনো দিনে অন্যান্য অনেক নেতাই ছিল, যাদের আজকের নেতাদের মত শুধু চালাকির দ্বারা রাজনীতি করাটা ছিল না। মানুষ হিসাবেও তাদের চরিত্রের একটা ভিত ছিল। বুর্জোয়া রাজনীতিই হোক বা বিরোধী রাজনীতিই হোক, তাদের শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি একটা বেশ উচু স্তরে ছিল। আপসমুখী কংগ্রেসী রাজনীতি বা বিরুদ্ধ পক্ষ আপসহীন বুর্জোয়া রাজনীতিতেও বড় বড় মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। আর এম এন রায় ওয়াজ অ্যান এক্সসেপশন, তিনি সত্যিই পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় প্রবেশ করেছেন, গভীর পাণ্ডিত্য তাঁর ছিল। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অনেক অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। এই রকম একজন মানুষ পার্টি গঠন করার চেষ্টা করেছেন।

ভারতবর্ষের ইন্টেলেকচুয়ালরা, এক সময় জহরলালের মতো ইন্টেলেকচুয়াল তাঁর দিকে প্রবলভাবে অ্যাট্রাকটেড হয়েছিলেন। এ সব অতীত দিনের কথা, অনেকেই এ সব খবর রাখেন না। তিনিও এ দেশে কোনও দল খাড়া করতে পারলেন না। যে দল খাড়া করলেন সেটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। শুধু তাই নয়, সেই দলের বেশিরভাগ লোকগুলো হয় সিআইএ'র এজেন্ট, নাহয় কেরিয়ার সিকার, না হয় এখানে ওখানে চাকরি করছে, এরা সব শুডো ইন্টেলেকচুয়াল হয়ে গেল। তারা কেউই রেভলিউশনারি হয়নি। অথচ তিনি অতবড় একজন ইন্টেলেকচুয়াল ছিলেন এবং তাঁর লাইফ একটা সময়ে রেভলিউশনারির মতই ছিল। ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে যাওয়া ফাঁসির আসামী এবং তিনি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের একটা ইমপর্ট্যান্ট পজিশনে ছিলেন। কিন্তু তাঁর হাত দিয়ে একজনও বড় মাপের রেভলিউশনারি তো দূরের কথা একজন সাধারণ রেভলিউশনারিও তৈরি হয়নি। অন্তত আমি তা দেখতে পাইনি। বরং দেখেছি ইগো সেন্ট্রিক, ফুল অফ ভ্যানিটিওয়ালা লোক তৈরি হয়েছে। আর কিছু পড়ুয়া পণ্ডিত এবং ব্যক্তিবাদের ঝোঁক সম্পন্ন সেলফিস টাইপের কতগুলো মানুষ তৈরি হয়েছে। এটা আমাকে অদ্ভুতভাবে ভাবিয়েছে যে—কমিউনিস্ট পার্টিটাকে গঠন করার জন্য কত ছেলেমেয়ে বাড়িঘর সর্বস্ব ত্যাগ করে, বাপ-মাকে কাঁদিয়ে এসে সবকিছু করার জন্য লাইফ দিয়ে পার্টিটাকে গড়বার চেষ্টা করল। অথচ আমরা দেখতে পেলাম পরবর্তী সময়ে সেই লোকগুলোই চরম সুবিধাবাদী হয়ে গেল, যাদের লাইফে কোনও প্রিন্সিপল নেই, ডিক্টাম নেই, ডেকোরাম নেই, নির্ধারিত নীতি নেই। এইগুলো আমাদের খুব ভাবিয়েছে এবং একটা জিনিস শুরু থেকেই আমাদের মাথায় ধাক্কা দিয়েছে, যদি সত্যি সত্যিই একটা বড় আদর্শ গ্রহণ করা হয়, তার ডেলিভারির ভেহিকেলটা কী হবে। যদি সত্যিই খুব বড় একটা আদর্শ হয়, কিন্তু সেটার ভেহিকেলটা যদি সঠিক না হয়, তাকে কংক্রিট সিচু য়েশনে ট্রান্সলেট করা, বাস্তবে রূপ দেওয়া এবং কার্যকরী করার জন্য ঠিক উপযুক্ত চরিত্র সম্পন্ন মানুষগুলো তৈরি না হয়; সেই বিপ্লবের উপযোগী চরিত্র, ক্যারেক্টার, ডিটারমিনেশনের দিক থেকে এবং আউটলুক ও কনসেপশনের দিক থেকে যদি সেইরকম ভাবে মানুষগুলো গড়ে না ওঠে, সকল কর্মী না হলেও অন্তত নেতৃত্বদানকারী কর্মীরা, নেতৃত্বের মধ্যে সকল নেতা না হোক অন্তত ন্যূনতম মেজরিটি—যদি তেমন ধরনের চরিত্রের আধার, কমিউনিস্ট চরিত্রের আধার নিয়ে এবং জীবনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করে কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন না করে, তা হলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ আলটিমেটলি এই চরিত্র গড়ে না তুলতে পারলে, বিপ্লবের উপযোগী করে চরিত্রটা গড়ে তুলতে না পারলে, যে মহৎ আদর্শটা যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করেছিলাম, তা রক্ত-মাংস ও রসের সাথে ভিতরে গিয়ে ঢোকে না। সেটা ওপরে বলার জন্য ওপর ওপর থেকে যায়। সেটা বড় বিপ্লবী আদর্শের যেটা প্রাণসত্তা বা মর্মবস্তু, তাকে ধ্বংস করে দেয়। এই কথাটা আমাদের খুব ভাবিয়েছিল।

তাই আমরা এই অভিজ্ঞতাগুলো থেকে বুঝেছিলাম, একটা বড় বিপ্লবী দল গড়ার জন্য শুধু একটা আদর্শ, রাস্তা, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ঠিক হলেও চলবে না। সেই রাস্তায় পদক্ষেপের জন্য একটা সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এথিক্যাল, মরাল সমস্ত দিক থেকে মুভমেন্ট শুরু করা দরকার। শুধু রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বক্তব্যটা শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী হবে, আর শিক্ষা সম্বন্ধে যখন বলতে যাব তখন শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি নেই বা ভালবাসা সম্বন্ধে যখন বলতে যাব তখন শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি থাকবে না, পারিবারিক সম্পর্ক, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা সম্বন্ধে যখন বলতে যাব, যৌনতা সম্বন্ধে যখন কোনও প্রবলেম সামনে আসবে তখন তা শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করছি না, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ, বন্ধুত্ব, কোনও ইমোশনলান ফ্যাক্টর, এগুলোর সামনে যখন পড়ছি তখন তাকে বিচার করার সময় শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি আমার কাজ করে না, তা হলে আর যাই হোক বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে না। এগুলো সবই তো শ্রেণি সংগ্রামের ইমপ্যাক্ট। অর্থাৎ শ্রেণিভাবধারার দ্বারা যে এগুলো প্রভাবিত, শ্রেণিসম্পর্কের দ্বারা যে এগুলো প্রভাবিত, তা এসব বিষয়ে কাজ করে না কি? এরকম যদি হয় মার্কসবাদটা যদি শুধু বক্তৃতায় এবং আন্দোলন বা লোক ক্ষেপাবার জন্য আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমি রবীন্দ্রনাথ, গ্যেটে বা বার্নার্ড শ'র ফলোয়ার হতে পারি—তা হলেও তাদের দিয়ে বিপ্লব হয় না। বিপ্লবী আন্দোলন মাঝপথে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। আমি বুঝেছি পরিষ্কার ভাষায় না বললেও রেভলিউশনারি থিওরি বলতে লেনিন কখনও পলিটিক্যাল, ইকনমিক থিওরি আর স্টেজ অফ রেভলিউশনটা ঠিক করা বোঝাননি। ফলে সোসালিস্ট মুভমেন্টটা কভারিং অল অ্যাসপেক্টস অফ লাইফ রিলিজ করতে হবে। আমরা সেইজন্যই মরালিটি, এথিক্স এবং ক্যারেক্টার বিল্ডিং-এর দিকে এত জোর দিয়েছি।"

('বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময়' বই থেকে)

রাজভবন ও উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক এআইকেকেএমএস-এর

কৃষকের ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আইনসঙ্গত করে সরকারকে সরাসরি চাষির কাছ থেকে ফসল কেনা সহ দশ দফা দাবিতে ২০ সেপ্টেম্বর রাজভবন ও উত্তরকন্যা অভিযান করবে এআইকেকেএমএস।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস বলেন, দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তিনটি কালা কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু কৃষকের ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেও আজও তা তারা কার্যকর করেনি। ফলে চাষিরা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সরকার সার, বীজ, কীটনাশক, ডিজেল সহ চাষের সমস্ত উপকরণ মুনাফাখোর একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে তুলে দিয়েছে এবং সরকারি মদতে তারা ইচ্ছামতো দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে চাষের খরচ ক্রমাগত বাড়ছে কিন্তু ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য না পাওয়ায় কৃষক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এবং অনেকে বেদনাদায়ক আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। তাছাড়া খরা, বন্যা সহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষতিতে, শস্য বিমা থাকা সত্ত্বেও বিমা কোম্পানির স্বার্থে রচিত সরকারি নীতির ফলে ফসলের ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে।

বৃষ্টি কম হওয়ায় জলের অভাবে পাট পচানো যাচ্ছে না। কোটি কোটি টাকার পাট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কৃষকদের এই ক্ষতিতে সাহায্য করার জন্য সরকারের টাকা নেই, কিন্তু হাতে গোনা গুটিকয়েক কর্পোরেট শিল্পপতিকে ১১ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব করে সাহায্য করার বেলায় বিজেপি সরকারের টাকার অভাব হয় না। খেতমজুরের সারা বছরের কাজের কোনও ব্যবস্থা নেই। এনরেগা প্রকল্পে জব কার্ডে একশো দিনের কাজ দেওয়ার গ্যারান্টি থাকলেও বছরে তারা এক মাসও কাজ পায় না, দৈনিক মজুরি পুরুষদের ক্ষেত্রে মাত্র ২১৩ টাকা ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৯৩ টাকা, তাও আবার অনেক ক্ষেত্রে এক বছরের মজুরির টাকা বাকি।

এই অবস্থায় একে তো অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির চাপে গরিব মানুষের বেঁচে থাকাই দায়, তার উপর কেন্দ্রীয় সরকার চাল, আটা, মুড়ি সহ সমস্ত প্যাকেটজাত খাদ্যদ্রব্যের ওপর জিএসটি চাপিয়েছে এবং বিদ্যুৎ বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে 'বিদ্যুৎ বিল ২০২২' পার্লামেন্টে পেশ করে অস্বাভাবিক হারে মাশুল বৃদ্ধি করতে চাইছে।

সঠিক আন্দোলনই কৃষকদের দাবি আদায়ের একমাত্র পথ। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর এমএসপি সহ অন্যান্য দাবিতে দিল্লিতে এক মহতী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে দেশের বিশিষ্ট কৃষক নেতারা ও কৃষি-বিজ্ঞানী সহ অনেক বুদ্ধিজীবী আলোচনা করবেন। ওইদিন দেশের সমস্ত রাজ্যের রাজধানী শহরে বিক্ষোভ,

চারের পাতায় দেখুন

পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ

চিৎপুর ব্রিজ ভাঙার জন্য উচ্ছেদ হওয়া বাসিন্দাদের পুনর্বাসন, ৬ নং ওয়ার্ডের ৫০ নং বস্তি পরিষ্কার করা ও পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি দাবিতে ৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা পৌর নিগমের ১ নম্বর বরো কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ পাইকপাড়া শাখার পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন স্থানীয় চিকিৎসক ঝোটন দাস, অধ্যাপক মেঘবরণ হাইতি, বিশিষ্ট ফুটবলার নিমাই মণ্ডল ও এলাকার বাসিন্দা শান্তি মণ্ডল। চেয়ারম্যান সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তৎপর হয়েছেন।

এরই সাথে চুনিবাবুর বাজারে জল জমা বন্ধ করা, পুরসভার তত্ত্বাবধানে চুনিবাবুর বাজার ও আশুবাবুর বাজারের সংস্কার, দত্তবাগান-পাইকপাড়া-বেলগাছিয়া রুটে ২১৯, ৪৭-এ ও ৩-এ বাস পুনরায় চালু করার দাবিও তোলা হয়। চেয়ারম্যান বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার প্রতিশ্রুতি দেন।

বকেয়া বেতনের দাবিতে
আইডিবিআই ব্যাঙ্কে বিক্ষোভ

আইডিবিআই ব্যাঙ্কের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কন্ট্রাক্ট কর্মীদের একটা বড় অংশ এখনও পর্যন্ত জুন, জুলাই এবং আগস্ট মাসের বেতন পাননি। অবিলম্বে তিন মাসের বেতন একসঙ্গে দেওয়া, প্রতিটি কর্মীর বকেয়া দ্রুত মিটিয়ে দেওয়া, পিএফ-ইএসআইয়ের টাকা মাসে মাসে জমা দেওয়া সহ বিভিন্ন দাবিতে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কন্ট্র্যাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতৃত্বে দেড় শতাধিক কর্মী প্রথমে ব্যাঙ্কের সামনে, পরে সিজিএম (পূর্বাঞ্চল) অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। সিজিএম বকেয়া বেতন যত দ্রুত সম্ভব মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ভেন্ডারের উপর চাপ সৃষ্টি করার এবং অন্যান্য সমস্যাগুলিও বিবেচনার আশ্বাস দেন। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সভাপতি জগন্নাথ রায়মণ্ডল, সহসভাপতি বরুণ চক্রবর্তী এবং সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস।

ম্যানহোলে শ্রমিককে নামতে বাধ্য করা হত্যার সামিল
এ আই ইউ টি ইউ সি

হরিয়ানার ভিওয়ানিতে পুর অফিসাররা দুই সাফাইকর্মীকে তাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ম্যানহোলে নামতে বাধ্য করায় দু'জনেরই মৃত্যু ঘটেছে। ১১ সেপ্টেম্বর এই মর্মান্তিক ঘটনার পর এআইইউটিইউসি-র ভিওয়ানি জেলা সম্পাদক কমরেড রাজকুমার জাঙ্গড়া এক বিবৃতিতে বলেন, এই মৃত্যুর জন্য দায়ী অফিসারদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ দায়ের করতে হবে। তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মানুষকে দিয়ে নর্দমা পরিষ্কারের ব্যবস্থা বন্ধ করার আইন ২০২০ থেকে সরকার ফেলে রেখেছে। তিনি অবিলম্বে আইন করে নিকাশি নালায় মানুষ নামানো বন্ধ করা ও মৃত কর্মীদের পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান।

হাওড়ায় ওয়াটার ক্যারিয়ার অ্যান্ড সুইপার ইউনিয়নের বিক্ষোভ

হাওড়া জেলার ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের অধীনস্থ ব্লক সহ আরআই দপ্তরে ওয়াটার ক্যারিয়ার ও সুইপার 'কর্মবন্ধু'রা নিজেদের কাজ ছাড়াও গ্রুপ-ডি কর্মচারীদের আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ দায়িত্ব নিয়ে দীর্ঘ ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে করে আসছেন। কিন্তু আজও তাঁদের মাসিক বেতন মাত্র ৩ হাজার টাকা। আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির এই সময়ে এই সামান্য বেতনে তাঁরা সংসার চালাতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে, 'কর্মবন্ধু' নয় অবিলম্বে কন্ট্রাকচুয়াল গ্রুপ-ডি কর্মচারী পদে নিয়োগ, অন্যান্য জেলার মতো ১৯৯৯ সাল থেকে বকেয়া দ্রুত প্রদান, সকল কর্মীর বোনাস, অবসরের পর এককালীন অন্তত ৩ লক্ষ টাকা প্রদান সহ নানা দাবিতে ৬ সেপ্টেম্বর 'হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট ওয়াটার ক্যারিয়ার অ্যান্ড সুইপার ইউনিয়ন'-এর পক্ষ থেকে জেলা ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

রায়দিঘিতে রাস্তা সারানোর দাবিতে অবরোধ

দক্ষিণ বিষ্ণুপর থেকে রায়দিঘি পর্যন্ত প্রায় ২০ কিলোমিটার এবং খাঁড়াপাড়া থেকে রায়দিঘি পর্যন্ত প্রায় ১১ কিমি রাস্তা মানুষ ও যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে রায়দিঘি সেতু থেকে ঢাকির মুখ ভায়া জটার দেউল পর্যন্ত প্রায় ১০ কিমি রাস্তা, রায়দিঘি সেতু থেকে দমকল খেয়াঘাট পর্যন্ত প্রায় ১৬ কিমি রাস্তা, কোম্পানির ঠেক থেকে আটেশ্বরতলা পর্যন্ত প্রায় ৮ কিমি রাস্তা সহ রায়দিঘি বিধানসভার রাস্তাগুলির একেবারেই বেহাল দশা।

এই রাস্তাগুলি সংস্কারের দাবিতে বহুবার স্থানীয় পিডব্লিউডি এবং থানায় স্মারকলিপি দেওয়া, রাস্তা অবরোধ করা হলেও প্রশাসন প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেনি। ইতিমধ্যে বর্ষায় গাড়ি দুর্ঘটনায় পথচারী মারা গিয়েছেন। বহুবার দুর্ঘটনায় গাড়ি উল্টে প্রসূতি মা, রোগী, ছাত্র-ছাত্রীরা আহত হয়েছেন। এলাকার ক্ষুব্ধ মানুষ ৭ সেপ্টেম্বর কোম্পানির ঠেক থেকে ১ নং চোদ্দ রশ্মী মোড় অবরোধ করেন। এস ইউ সি আই (সি) ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গুণসিন্ধু হালদার, বিশ্বনাথ সরদার, রেণুপদ হালদার, জ্ঞানতোষ প্রামাণিক প্রমুখ এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। প্রায় দু'ঘণ্টা অবরোধ চলে। পরে মথুরাপুর ব্লক ২-এর জয়েন্ট বিডিও এবং রায়দিঘি থানার পুলিশ অফিসার এসে খাঁড়াপাড়া পর্যন্ত রাস্তা দ্রুত সংস্কারের কাজ শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

প্রকাশিত
পথিকৃৎ শারদ সংখ্যা

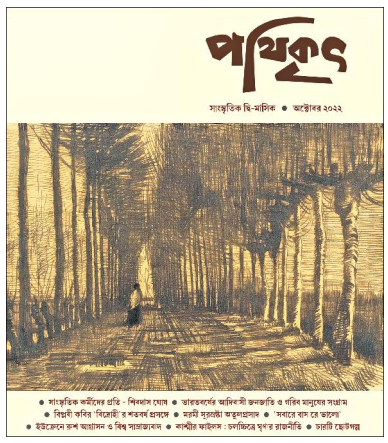

এই সংখ্যায় ঃ

● সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রতি শিবদাস ঘোষ ● ভারতবর্ষের আদিবাসী জনজাতি ও গরিব মানুষের সংগ্রাম ● বিপ্লবী কবির 'বিদ্রোহী'র শতবর্ষ ● অতুলপ্রসাদ সেন ● ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন ও বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ● কাশ্মীর ফাইলস ● ছোট গল্প

অভিযানের ডাক

তিনের পাতার পর

সমাবেশ, ডেপুটেশন সহ কৃষকদের নানা কর্মসূচি পালিত হবে।

দাবিসমূহ ঃ ১) কৃষকের ফসলের এমএসপি আইনসঙ্গত করে সরকারকে সরাসরি চাষির কাছ থেকে ফসল কিনতে হবে। ২) সারের কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে। ৩) স্বল্পমূল্যে চাষিকে সার, বীজ, কীটনাশক, ডিজেল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। ৪) খরা-বন্যা প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। ৫) খরা-বন্যায় ফসলের ক্ষতিতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ৬) জব কার্ডে বছরে ২০০ দিন কাজ ও ৪০০ টাকা মজুরি দিতে হবে। ৭) পান চাষকে কৃষি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং পান বিক্রিতে ফোড়ে রাজের দাপট বন্ধ করতে হবে। ৮) পাটের দাম কুইন্টাল প্রতি ১২০০০ টাকা দিতে হবে এবং জেসিআই-কে সরাসরি চাষির কাছ থেকে পাট কিনতে হবে। ৯) চা চাষকে কৃষি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং মধ্য চা-চাষির মতো ক্ষুদ্র-প্রান্তিক চাষিকেও সমস্ত উপকরণ বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে। ১০) জুট কর্পোরেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল গঠন করে রাজ্য সরকারকে চাষির পাট কেনার ব্যবস্থা করতে হবে।

কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে
এগরা মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ

সাম্প্রতিক নিম্নচাপজনিত অতিবর্ষণে পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা মহকুমায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সহ ১১ দফা দাবিতে ৩০ আগস্ট মহকুমা সেচ দপ্তর ও মহকুমা শাসক অফিসে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

এগরা মহকুমা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি এবং দুবদা ও বারচৌকা বেসিন সংস্কার কমিটির পক্ষ থেকে এই কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। দুই শতাধিক মহিলা সহ জলবন্দি এলাকার মানুষজন ওই কর্মসূচিতে সামিল হন এবং ব্যস্ততম এগরা-বাজকুল রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। মহকুমা শাসক দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

বিলকিস বানো ঃ গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে এআইএমএসএস

২০০২ সালে গুজরাট গণহত্যার সময়ে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা বিলকিস বানোকে গণধর্ষণ করে তাঁর পরিবারের ১৪ সদস্যকে হত্যা করেছিল দুষ্কৃতীরা। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আসামী সেই অপরাধীদের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির দিনে ন্যায়বিচারকে পায়ে মাড়িয়ে মুক্তি দিয়েছে গুজরাটের বিজেপি সরকার। বিজেপি ও তার সহযোগী সংগঠনগুলি ওই জঘন্য অপরাধীদের মালা পরিয়ে মিষ্টি খাইয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছে। এই নজিরবিহীন ঘটনার প্রতিবাদে এবং ওই অপরাধীদের পুনরায় গ্রেফতার ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। সংগৃহীত হাজার হাজার স্বাক্ষর সংবলিত পোস্টকার্ড ১৫ সেপ্টেম্বর মিছিল সহকারে জেলা পোস্টঅফিসগুলিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির উদ্দেশে পোস্ট করা হবে।

রাজ্যের প্রায় সব জেলাতে সংগঠনের কর্মীরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে যেমন স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন আবার রাস্তার মোড়, গঞ্জ, বাজারে মাইক প্রচার সহ স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হচ্ছে। ছাত্র-যুব-মহিলা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাক্ষর করছেন এবং কেন্দ্র ও গুজরাট সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। **ছবি ঃ জলপাইগুড়ি**

চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতির দাবিতে মিছিল

'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন' বাঁকুড়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট কাম ভাইস প্রিন্সিপালের কাছে চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতির দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সংগঠনের সম্পাদিকা লক্ষ্মী সরকারের নেতৃত্বে এলাকার মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। হাসপাতালের গোবিন্দনগর আউটডোর থেকে লোকপুর প্রশাসনিক ভবন পর্যন্ত মিছিল করে কর্তৃপক্ষের কাছে দাবিগুলি পেশ করা হয়।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বিমানির্ভর না করা, হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বাধ্যতামূলক না করা সহ ক্রমবর্ধমান রোগী অনুপাতে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনমতো ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, অক্সিজেন সহ চিকিৎসার যন্ত্রপাতি সরবরাহ, আগের মতো ৬৪৪টি ওষুধ সরবরাহ অব্যাহত রাখা, বেডের সংখ্যা বাড়ানো, প্যাথোলজি পরীক্ষার রিপোর্ট দ্রুত প্রদান, কিডনি রোগীসহ মুমূর্ষু রোগীদের হয়রানি বন্ধ করা ইত্যাদি দাবি পেশ করা হয়। কর্তৃপক্ষ দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে স্থানীয় সমস্যাগুলি দ্রুততার সাথে সমাধান করবেন বলে প্রতিনিধিদের আশ্বাস দেন এবং বিষয়গুলি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানাবেন বলে উল্লেখ করেন।

১০০ দিনের কাজে বরাদ্দ ছাঁটাই ও দুর্নীতি শাসকদের, ভুগছে মানুষ

চলতি অর্থবর্ষে ১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে বরাদ্দ কমেছে গত অর্থবর্ষের থেকে ২৫ শতাংশেরও বেশি। গত অর্থবর্ষে তার আগের অর্থবর্ষের থেকে ৩৪ শতাংশের বেশি কমানো হয়েছিল। একটা সরকার যখন জনকল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ এইভাবে ক্রমাগত কমিয়ে চলে তখন প্রমাণ হয়ে যায় তারা জনস্বার্থ নিয়ে আদৌ ভাবিত নয়। দেশের একটা বড় অংশের মানুষ, যাদের পরিবারে দু'বেলা খাবার জোগাড় করাটাই কঠিন, তাদের কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকার দেখে তা বোঝা যায় এই পরিসংখ্যান থেকে।

সংসদীয় কমিটিতে ১০০ দিনের প্রকল্পে কাজের দিন বাড়িয়ে ১৫০ দিন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে গড়ে ৫০ দিনের বেশি কাজের সুযোগ পান না দেশের গ্রামীণ এলাকার মানুষ। ২০২৩ সালে প্রতি পরিবারে ১০০ দিনের কাজ পৌঁছতে ২.৬৪ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা দরকার ছিল। সেখানে এ বছরে মাত্র ৭৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। হিসাব করে দেখা যাচ্ছে, এতে সাড়ে সাত কোটি পরিবারে বড়জোর ৩০ দিনের কাজ দেওয়া সম্ভব।

সরকার বরাদ্দ কমাচ্ছে কেন? ১০০ দিনের কাজের চাহিদা কী কমছে? বাস্তবে মোটেও কাজের চাহিদা কমছে না। নানা সংস্থার গবেষণা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, বেকারি, দারিদ্র বাড়ছে ভারতে। সম্প্রতি প্রকাশিত রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নয়ন সূচকে (২০২১-২২) ভারত রয়েছে ১৩২ নম্বরে। বিশ্বের ১৯১টি দেশের মধ্যে দেশের এই লজ্জাজনক স্থান। উন্নয়ন সূচকের প্রধান মাপকাঠি শিক্ষা এবং মানুষের কোনওরকমে খেয়ে-পরে জীবন যাপন করা। স্বভাবতই এর সাথে একজন মানুষের আয়ের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

প্রধানমন্ত্রীর 'আচ্ছে দিনে'র ভারত গত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বাধিক বেকারির দেশে পরিণত হয়েছে। বেকারের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে। এর জন্য দায়ী পুঁজিবাদী সংকটগ্রস্ত বাজার অর্থনীতি। শিল্পে ভয়ঙ্করতম মন্দা চলছে। কারখানা খোলার বদলে একের পর এক লালবাতি জ্বলছে, হচ্ছে ছাঁটাই। করোনাজনিত লকডাউনে গত দু'বছরে পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে গ্রামে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন, কাজের নিশ্চয়তা না থাকায় তারা অনেকেই আর ফিরে যাননি। গ্রামে চাষবাস অলাভজনক। মুনাফালোভী পুঁজিবাদী বাজারের কবলে পড়ে ছোট চাষি, এমনকি মধ্যবিত্ত চাষিরাও পরিবার প্রতিপালন করতে হিমসিম খাচ্ছেন। ফড়ে-আড়তদারদের পাল্লায় তাদের জীবন জেরবার। বহু পরিশ্রমে ফলানো ফসলের লাভের গুড় খেয়ে যাচ্ছে তারা। ফলে চাষি পরিবারের বহু যুবক হয় শহরের দিকে দৌড়চ্ছে কোনও একটা কাজের খোঁজে অথবা ১০০ দিনের প্রকল্পে দৈনিক ২২৩ টাকার ভরসায় গ্রামেই কোনওরকমে দিন কাটাচ্ছে। পুকুর বা বাঁধের মাটি কাটা, খেতে-ইটভাটায় কাজ, গাছের চারা পোঁতা ইত্যাদি সামান্য কাজ পাওয়ার আশায় পঞ্চায়েত দপ্তরে কিংবা প্রভাবশালী নেতাদের আশেপাশে চরকি পাক খাচ্ছে। দৈনিক ২২৩ টাকা পেতে অসংখ্য মানুষকে যখন বারবার প্রশাসনিক দপ্তরে দৌড়তে হচ্ছে, তার পরও নেতা-মন্ত্রীরা কি দাবি করতে পারেন, ১০০ দিনের কাজে চাহিদা কমছে? তা হলে এই খাতে সরকার বরাদ্দ কমাচ্ছে কেন?

১০০ দিনের প্রকল্পে বরাদ্দ কমানোই শুধু নয়, এই প্রকল্প নিয়ে চলছে সীমাহীন অবহেলা। তার উপর চলছে ব্যাপক দুর্নীতি। বহু মানুষ বছরের শেষে জবকার্ড পাচ্ছেন। ফলে ১০০ দিন দূর অস্ত, ১৫-২০ দিনের হিসেবে কাজ পাচ্ছেন তারা। তাও তার টাকা পাচ্ছেন না অনেকে। এমনকি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তাদের নামে টাকা এলেও সেই টাকা তুলে নিচ্ছে দালালরা। প্রকৃত জবকার্ডধারী অর্থাৎ ১০০ দিনের কাজ পাওয়ার যোগ্য যারা তাদের বাদ দিয়ে সরকারের কাছের লোক হিসাবে পরিচিতদের কাজ পাইয়ে দেওয়া চলছে। এ ছাড়াও কাজের চাহিদা কম, এই ভুয়ো দাবি করে কাজের দিন কমানো হচ্ছে।

একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্নীতি রোধের অছিলায় পশ্চিমবঙ্গের মতো বিরোধী দল শাসিত রাজগুলিতে ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে। অন্যদিকে এই অজুহাতেই যে সব শর্ত চাপাচ্ছে তাতে জবকার্ডধারীদের হাতে উন্নত স্মার্টফোন ও হাইস্পিড ইন্টারনেট না থাকলে হাজিরা নথিভুক্ত করাই অসম্ভব। ভারতের গ্রামাঞ্চলে এই দুটি শর্ত পূরণ করতে পারেন কত শতাংশ মানুষ? বেশিরভাগই পারেন না। ফলে কাজ পাওয়াটাই অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে।

অথচ সরকার যদি সমস্ত কর্মক্ষম মানুষকে কাজ দিতে চাইত, তাহলে এই প্রকল্পে ২২৩ টাকা নয়, ন্যূনতম মজুরির হারে শ্রমিকদের মজুরি দিত। পরিকল্পনামাফিক স্থায়ী পরিকাঠামো ও সম্পদ সৃষ্টির কাজে ১০০ দিনের কাজকে লাগাতে পারলে গ্রামীণ জনগণের স্থায়ী কর্মসংস্থানও হতে পারত। কৃষিমজুরিকে এই প্রকল্পের অর্ন্তভুক্ত করলে কৃষিশ্রমিকের সমস্যারও সমাধান কিছুটা হতে পারত। কিন্তু সরকার তো বেকার সমস্যা সমাধানে আগ্রহী নয়। বেকারত্বের চাপে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা একেবারে যাতে ভেঙে না পড়ে তার জন্য যতটুকু ঠেকা দিয়ে গরিব মানুষকে গ্রামে আটকে রাখা যায় তার বেশি তারা করতে নারাজ। তাই ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পকে শাসক দলগুলো দেখায় তাদের বদান্যতা হিসাবে, মানুষের কাজ পাওয়ার অধিকার হিসাবে নয়। সে জন্যই নানা অজুহাতে এই প্রকল্পে বরাদ্দ ছাঁটাই করে চলে শাসকরা। অথচ বৃহৎ শিল্পপতিদের ট্যাক্স ছাড় দিতে, ঋণ মকুব করতে তাদের আটকায় না। এর থেকে বোঝা যায়, গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি সরকারের কোনও দায়দায়িত্ব নেই। তাদের যত দায় শিল্পপতিদের প্রতি।

নেতাজির পথে চলা আপনার কর্ম নয়

একের পাতার পর

জনসংঘ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মিলিত উদ্যোগে তৈরি হয় ভারতীয় জনতা পার্টি। স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু মহাসভা এবং আরএসএসের ভূমিকা ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতার। সেই সময়কার ইতিহাসের খবর যাঁদের ভাল করে জানা নেই, তাঁরা প্রশ্ন করতে পারেন— এ কি কখনও হতে পারে যে, কোনও ভারতবাসী, ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ের বিরোধিতা করছে। হ্যাঁ হতে পারে, যদি কারও দেশ সম্পর্কে, জাতীয়তা সম্পর্কে ধারণাটিই ঘোলাটে হয়, যদি এই ধারণার পিছনে অন্ধতা কাজ করে, পশ্চাৎপদ চিন্তার প্রভাব কাজ করে। ঠিক এই জিনিসটিই ঘটেছিল আরএসএস-হিন্দু মহাসভার ক্ষেত্রে।

আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠা ১৯২৫ সালে। প্রতিষ্ঠাতা ডঃ হেডগেওয়ারের পরে এম এস গোলওয়ালকর আরএসএস-এর পরিচালক হন। স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে আরএসএসের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে গোলওয়ালকর বলেছিলেন, "ব্রিটিশ বিরোধিতাকে ভাবা হচ্ছে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সমার্থক। এই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলন, তার নেতৃবর্গ ও সাধারণ মানুষের উপর বিনাশকারী প্রভাব ফেলেছিল" (চিন্তাচয়ন, ১ম খণ্ড, পৃ ঃ ১২৫)। অর্থাৎ আরএসএসের কাছে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল একটি 'প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন'। স্বাভাবিক ভাবেই এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলা আরএসএস যে সর্বদাই জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বাস্তবে স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বা শান্তিপূর্ণ কোনও সংগ্রামেই আরএসএস অংশগ্রহণ করেনি। পূর্বসূরিদের এই কলঙ্কিত অধ্যায় এখন জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে বিজেপিকে বিপাকে ফেলেছে।

কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে আরএসএসের এমন বিকৃত ধারণা হল কেন? আসলে জাতি গঠনের বৈজ্ঞানিক নিয়মকে, এ সম্পর্কিত ইতিহাসের ধারাকে তথাকথিত এই হিন্দুত্ববাদীরা উপলব্ধিই করতে পারেনি। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-জৈন-শিখ-পারসিক-খ্রিস্টান ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মের মানুষ শত-সহস্র বছর ভারত ভূখণ্ডে বাস করে এসেছে পরস্পরের সাথে নিবিড় সংযোগ গড়ে তুলে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অধীনতার শৃঙ্খল থেকে, একই শোষণ-যন্ত্রণা, একই অত্যাচার-বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্খা ভারতীয় জাতি ধারণার জন্ম দেয়। জাতি গড়ে ওঠার এই বৈজ্ঞানিক কারণ ও পদ্ধতিটাকেই তারা অস্বীকার করে। বিজ্ঞানের যুক্তি ও ইতিহাসের ধারা অনুসরণ না করে মনগড়া ধারণার দ্বারাই আরএসএসের নেতারা পরিচালিত হয়েছেন। এই চিন্তা থেকেই তাঁরা সর্বদা হিন্দুরাষ্ট্রের দাবি করেছেন। পরাধীন ভারতে তাঁরা ব্রিটিশদের শত্রু মনে করতেন না, করতেন মুসলমানদের। ঠিক যেমন এখনও তাঁরা শোষক পুঁজিপতিদের নয়, শত্রু মনে করেন মুসলিমদের। তাঁদের মতে, "আমাদের দেশের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস এই কথাই বলে যে, সব কিছু করেছে একমাত্র হিন্দুরা। এর অর্থ কেবল হিন্দুরাই এই মাটির সন্তান হিসেবে এখানে বসবাস করেছে" (গোলওয়ালকর, চিন্তাচয়ন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৩-২৪)। আরএসএসের এই বক্তব্য ভারতীয় জাতি গঠনের ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিরোধী। এমনকি বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথও এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'কোনও সভ্যতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত একটিও পাওয়া যায় না। একটি সুসভ্য জাতি আসিয়া কোনও জাতির সহিত মিশিয়া যাওয়া ছাড়াই যে জাতি সভ্য হইয়া উঠিয়াছে— এরূপ একটি জাতিও জগতে নাই।" (বিবেকানন্দ রচনাবলি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪২)। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, "ভারতবর্ষের কেবল হিন্দু চিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থপতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দু-মুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়ের পূর্ণ পরিচয়" (রবীন্দ্র রচনাবলি, ১৪ খণ্ড, পৃঃ ২৫৯, বিশ্বভারতী সংস্করণ)। বিজেপি নেতারা এরপর হয়তো বলবেন, বিবেকানন্দ ঠিকঠাক হিন্দু ছিলেন না!

আবার, স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করা এক জিনিস, আর সক্রিয় ভাবে তার বিরোধিতা করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। আরএসএস-হিন্দু মহাসভা সক্রিয় ভাবেই স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন বুঝে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসাবে যখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের ঘোষিত লাইনের বাইরে গিয়েও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের ডাক দিচ্ছেন এবং প্রয়োজনে সশস্ত্র লড়াইয়ের কথা বলছেন, কংগ্রেস থেকে গান্ধীবাদীদের দ্বারা বহিষ্কৃত হয়েও বিদেশে গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ব্রিটিশের বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে সামিল হচ্ছেন, তখন যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে সেই প্রসঙ্গে আরএসএসের শীর্ষনেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকর ১৯৪১ সালে ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার ২৩তম অধিবেশনে বলছেন, "ভারতের প্রতিরক্ষার কথা বলতে গেলে, ভারত সরকারের সমস্ত যুদ্ধ প্রস্তুতিকে হিন্দুদের অবশ্যই দ্বিধাহীন চিত্তে সমর্থন করতে হবে। ... হিন্দুদের বৃহৎ সংখ্যায় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীতে যোগ দিতে হবে" (সাভারকর সমগ্র, খণ্ড-৬, মহারাষ্ট্র প্রান্তিক হিন্দুসভা, পুণা, ১৯৬৩, পৃঃ ৪৬০)। শাসক ব্রিটিশের নির্লজ্জ তাঁবেদারির কী প্রকৃষ্ট উদাহরণ !

যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার তার সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য পূরণের জন্য যখন নতুন সশস্ত্র ব্যাটেলিয়ান তৈরির সিদ্ধান্ত নিল তখন সাভারকরের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা সিদ্ধান্ত নেয়, এই প্রচেষ্টাকে সফল করতে একটা বড় সংখ্যক হিন্দু যুবকের নাম নথিভুক্ত করাতে হবে। সেদিন হিন্দু মহাসভা ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার জন্য দেশের নানা প্রান্তে সহায়ক কেন্দ্র খুলেছিল যাতে হিন্দু যুবকেরা সহজেই ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারে। এই বাহিনীকেই ব্রিটিশ পাঠিয়েছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের হত্যা করতে। সাভারকর সেই কাজে ব্রিটিশদের পাশে ছিলেন। শাসক ব্রিটিশের কি নির্লজ্জ গোলামি! ব্রিটিশ-গোলামির এরকম আরও অজস্র উদাহরণ রয়েছে। ভারতবাসীর লজ্জা যে দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজেকে এই আরএসএসের অনুগত সেবক বলতে গর্ববোধ করেন!

প্রধানমন্ত্রীর দল বিজেপি কিংবা আরএসএসের লক্ষ্য যে হিন্দু রাষ্ট্র তা আজ আর তারা গোপন করে না। সেই রাষ্ট্রে মুসলমানরা তাদের গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকারগুলি হারিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে থাকবে। এই হীন সাম্প্রদায়িক চিন্তা সেদিনও একই রকম ভাবে লালন করত হিন্দু মহাসভা এবং আরএসএস। তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নেতাজি সেদিন বলেছিলেন, "হিন্দুরা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া 'হিন্দুরাজের' ধ্বনি শোনা যায়। এগুলি সর্বৈব অলস চিন্তা।" প্রধানমন্ত্রী কি নেতাজির এই বক্তব্য পড়ে দেখেছেন কখনও? সেদিন এই সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির শক্তিবৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন হয়ে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগের মতো সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি আগের থেকে অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে।" এদের সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী লোক ক্ষুদ্র ও ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছে— স্বাধীনতা সংগ্রামে এই শ্রেণির লোককেও শত্রু মধ্যে গণ্য করা প্রয়োজন।" এই আরএসএসকে নেতাজি ব্রিটিশের মতোই দেশের শত্রু বলে গণ্য করতেন। আজ কেউ যদি এদের দেশের মানুষের বন্ধু মনে করে, আর অন্য দিকে নেতাজির প্রশস্তি গায়, তা হলে তাদের ডাহা মতলববাজ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে!

সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল দেশকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্ত করে একটি শোষণহীন, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা। সুভাষচন্দ্র রাজনীতিকে সব সময় ধর্মীয় চিন্তা থেকে দূরে রাখার কথা বলেছেন। তিনি মনে করতেন দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যাগুলি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জনগণকে একই রকম ভাবে জর্জরিত করছে। এর মোকাবিলাও করতে হবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ ভাবে। সুভাষচন্দ্রের আজাদহিন্দ বাহিনী হিন্দু-মুসলমান মিলনের এক অপূর্ব নিদর্শন। বাহিনীর অন্যতম প্রধান ছিলেন একজন মুসলমান। বিপরীতে ধর্মীয় বিভেদকে উস্কানি দিয়ে ভোটব্যাঙ্ক তৈরিই বিজেপির রাজনীতির মূল কথা। সাম্প্রদায়িকতাই তাদের মূলধন। নেতাজির চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। আর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার একদিকে শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের দেশের মানুষের উপর তীব্র শোষণ চালিয়ে যেতে দিচ্ছে, অন্য দিকে দেশের সমস্ত সম্পদ লুঠতরাজের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে যাতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ গড়ে উঠতে না পারে, সেজন্য মানুষকে মাতিয়ে দিচ্ছে সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে। অর্থাৎ, কোনও দিক থেকেই বিজেপির সঙ্গে নেতাজির চিন্তার কোনও মিল নেই। বরং উভয়ের চিন্তা পরস্পরের বিপরীত। তবে প্রধানমন্ত্রী এমন কথা বললেন কেন? প্রধানমন্ত্রী কি তাঁর দলের এবং নিজের এই অতীত কার্যলাপকে ভুল বলে স্বীকার করেছেন? স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্রিটিশকে সহযোগিতার জন্য কি তিনি এবং তাঁর দল দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন? না, চাননি। অর্থাৎ তিনি নেতাজির পথেই চলছেন, এ কথা বলার দ্বারা প্রধানমন্ত্রী বাস্তবে চরম মিথ্যাচার করলেন এবং একই সাথে গোটা দেশবাসীর সাথে আবার একবার প্রতারণা করলেন। কিন্তু কেন বারবার তাঁদের এমন প্রতারণার আশ্রয় নিতে হচ্ছে?

আসলে বিজেপি নেতারা ভালভাবেই জানেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেদের দেশদ্রোহী ভূমিকার জন্য জনমনে তাঁরা নিন্দিত। তাছাড়া তাঁদের দলের এমন কেউ নেতা নেই যাঁকে তাঁরা আদর্শ নেতা হিসাবে দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে কংগ্রেসের এক দক্ষিণপন্থী নেতা, যিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্রের চরম বিরোধী এবং যিনি গান্ধীহত্যার পর আরএসএসকে দেশজোড়া গণরোষের হাতে থেকে নানা কৌশলে রক্ষা করেছিলেন, তাঁর বিশাল মূর্তি স্থাপন করে তাঁকেই তো পুজো করছেন নরেন্দ্র মোদিরা। তেমনই তাঁরা জানেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন নেতা হিসাবে জনমানসে আজও শ্রদ্ধার সবচেয়ে বড় আসনটি রয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্রেরই। তাই তাঁদের লক্ষ্য, প্রকৃত ইতিহাস ভুলিয়ে দিয়ে এক বিকৃত ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই কর্মসূচিরই অঙ্গ নিজেকে ও নিজেদের নেতাজি অনুসারী হিসাবে দেশের মানুষের সামনে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা। তারই অঙ্গ সাড়ম্বর সরকারি অনুষ্ঠান, শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের ভণ্ডামি।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের নামে এ যেমন গোটা দেশবাসীর সাথে প্রতারণা, তেমনই নেতাজির প্রতিও চরম অবমাননা। আজ যদি নেতাজির প্রতি সরাসরি কেউ অসম্মান প্রদর্শন করত, দেশের মানুষ কি মেনে নিত? তা হলে এই যে, শুধুমাত্র দলীয় স্বার্থে, ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে, মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য নেতাজিকে ব্যবহার করা, নেতাজির আদর্শ, জীবন-সংগ্রাম, তাঁর লক্ষ্য সব কিছুকে বাদ দিয়ে শুধু তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা, এটাও কি নেতাজির প্রতি চরম অসম্মান নয়? এটা কি দেশের মানুষ নীরবে মেনে নেবে? এটা মেনে নিয়ে আমরা কি কেউ নেতাজিকে সম্মান জানাতে পারব? জানালে তা কি যথার্থ সম্মান জানানো হবে?

নেতাজির প্রতি যথার্থ সম্মান জানানো যেতে পারে একমাত্র তাঁর অপূরিত স্বপ্নকে সফল করার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার মধ্য দিয়ে। সেই স্বপ্ন ছিল এমন একটি স্বাধীন ভারত গড়ে তোলা যেখানে শোষণ থাকবে না, নিপীড়ন থাকবে না, ধর্ম-বর্ণের বিভেদ থাকবে না, বেকারি-অনাহার থাকবে না। সমস্ত মানুষের স্বাধীন বিকাশ ঘটবে। বিজেপির তথা নরেন্দ্র মোদি পরিচালিত কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের প্রতিটি কাজই নেতাজির এই আদর্শ ও লক্ষ্যের পুরোপুরি বিরোধী। তাই আজ নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানানোর একটি অন্যতম শর্ত বিজেপির এই প্রতারণার রাজনীতিকে জনসমক্ষে উদঘাটিত করা এবং তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো।

বিলকিসরা সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার চায়

কিন্তু তা মিলবে কীভাবে?

না, বিলকিস বানো একফোঁটা চোখের জল ফেলেননি, শুধু শঙ্কায় ঘৃণায় অপমানে শোকে পাথর হয়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁর আইনজীবী মারফত বিবেকবান মানুষের কাছে আবেদন রেখেছেন, 'আমাকে নির্ভয়ে বাঁচার অধিকার ফিরিয়ে দিন'। অপরাধীদের মুক্তি আমার থেকে শান্তি কেড়ে নিয়েছে এবং ন্যায়বিচারের প্রতি আমার বিশ্বাসকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এই দুঃখ এবং বিশ্বাস নড়ে যাওয়ার বিষয়টি শুধু আমার একার নয়, প্রতিটি মহিলা—যারা আদালতে ন্যায়বিচারের জন্য সংগ্রাম করছেন, তাঁদের সকলের।' ভারতের এক সাধারণ মেয়ের বিশ্বাস নড়ে যাওয়ার, শান্তি হারিয়ে যাওয়ার, আতঙ্কের অতলে ডুবে যাওয়ার সময়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দেশ যখন পালন করছে স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান সেই 'অমৃত মহোৎসব'-এর তীব্র আলোর রোশনাইয়ের বিপরীতে বিলকিস বানোরা তলিয়ে যাচ্ছে এক গভীর অন্ধকারে। না, এ কোনও সিনেমার কাহিনি নয়, নয় শুধু গুজরাতের দাহোদ জেলার রাধিকাপুর গ্রামের এক ন্যায়বিচারপ্রার্থীর কাহিনি। এ ঘটনা গোটা দেশের মানুষের সম্মানহানির ঘটনা।

জেনে যে-কেউ অবাক হবেন, ২০০৮-এর ২১ জানুয়ারি থেকে গোধরা জেলে বন্দি ১১ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামি ২০২২ এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত যতদিন জেলে থেকেছে তার থেকে বেশি দিন প্যারোলে মুক্ত অবস্থায় থেকেছে জেলের বাইরে! একবার প্যারোল থেকে ফিরে তারা পরের বার প্যারোলের জন্য আবেদন জানিয়েছে। প্যারোলে মুক্ত হয়ে সাক্ষীর বয়ান বদলাতে চাপ দিয়েছে, আক্রান্ত পরিবারকে হুমকি দিয়েছে, সদর্পে অংশগ্রহণ করেছে শাসক বিজেপির মিটিংয়ে মিছিলে। সেই প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত গুজরাটের রাধিকাপুরের বিলকিস বানোর জীবনকে ঠিক কতটা দুর্বিষহ করে তুলেছে তা বোঝা কি খুব কঠিন?

ঘটনাটা ২০০২ এর মার্চে গুজরাটে পরিকল্পিত দাঙ্গা ও গণহত্যার সময়ের। বিলকিস তখন ২১ বছরের তরুণী। ওই দাঙ্গার কবলে পড়ে তাঁর পরিবারও। তাঁর চোখের সামনে পরিবারের সাত জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়, যার মধ্যে তাঁর তিন বছরের শিশুকন্যাও ছিল। অন্তঃসত্ত্বা বিলকিস সহ ৯ জন মহিলাকে গণধর্ষণ করে ওই নরপশুরা। ওই অবস্থায় একটি মেয়ের মনের অবস্থা কী হয়? আর কেউ হলে হয়তো পাগলও হয়ে যেতে পারতো। বিলকিস বানো ও তাঁর পরিবার লড়াইটা এগিয়ে নিয়ে গেছেন, ন্যায় বিচারে আশা রেখেছেন। এই জন্যেই তো বিলকিস বানো শুধুমাত্র একটি অত্যাচারিতা মেয়ে নন, বিলকিস একটি মর্যাদার প্রতীক। যাকে কালিমালিপ্ত করেছে বিচারব্যবস্থা-বিজেপি-আরএসএস-বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তির 'অমৃত মহোৎসব' উপলক্ষে গণহত্যা ও গণধর্ষণে সাজাপ্রাপ্তদের শাস্তি মকুব করা হল। এই নরপশুদের কারামুক্তিতে উল্লসিত হয়ে এ দেশেরই জন কয়েক মেয়ে তাদের জয়মাল্যে বরণ করল। এরা সকলেই হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী আরএসএস, বিজেপির নানা শাখার সদস্য। অথচ তাদের তো মহিলা হিসাবে এর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার ঝড় তোলার কথা ছিল! ধর্মীয় মৌলবাদ মানুষের মনকে যে অন্ধতা, যে উগ্রতার বিষে জারিত করে তার রূপ এমনই! গভীরভাবে ভাবলে দেখা যাবে, বিলকিস বানোর ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। হাথরস, উন্নাও, ভয়ঙ্কর ধর্ষণকাণ্ডের সঙ্গে এক পংক্তিতে রেখে বিচার করলে এদের মধ্যে চরিত্রগত মিল পাওয়া যাবে। জম্মুতে ধর্ষণের ঘটনায় দোষীদের মুক্তির দাবিতে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে বিজেপি কর্মীদের মিছিলের সঙ্গে পার্থক্য করা যাবে না উলুধ্বনি দিয়ে বিজয়মাল্য পরিয়ে অপরাধীদের বরণ করে নেওয়ার এই ঘটনাকে। মৌলবাদ মানুষের চিন্তাকে একটি সংকীর্ণ খাতে বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। মানুষের চোখের সামনে এমনভাবে সুউচ্চ পাঁচিল তুলে দেয়, যার থেকে চোখ সরিয়ে অন্য কিছু দেখা সম্ভব নয়, চিন্তা করা সম্ভব নয়। তাই অনেকে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে দেশে প্রথম দলিত সম্প্রদায়ের এক মহিলা রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরে। নিজেদের 'শিক্ষিত' 'নিরপেক্ষ বিচারধারার মানুষ' বলে যারা মনে করে, দেশের এই 'অভূতপূর্ব অগ্রগতিতে' বুকের ভেতরটা গর্বে তাদের টানটান হয়ে ওঠে। ভুলে যায় হাথরসে দলিত কিশোরীকে গণধর্ষণের ঘটনায় উচ্চবর্ণের অপরাধীদের আড়াল করার কী উদগ্র প্রচেষ্টা ছিল সরকারের প্রতিটি স্তরে। ৭৫তম স্বাধীনতার বর্ষপূর্তিতে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে নারীশক্তি, নারী স্বাধীনতার কথাগুলি শুনে অনেকের ভেতরটা আবেগে অনুরণিত হয়ে উঠেছে। গণধর্ষণ ও হত্যায় সাজাপ্রাপ্ত ১১ জনের কারামুক্ত হওয়ার পর বিলকিস বানোর পরিবার সহ ঘটনার সাক্ষী বাকি মুসলমান পরিবারগুলি এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, এ সংবাদটাকে তার সাপেক্ষে নেহাতই ছোট বলে মনে হয়। আবার কেউ ঠিক অতটাও হালকাভাবে নেয় না ঘটনাকে। আশা করে তাকিয়ে থাকে— 'দেখা যাক সুপ্রিম কোর্টে তো কেস হল, কী হয়'। মনে থাকে না, অতীতে গুজরাট দাঙ্গার নায়ক নরেন্দ্র মোদিকে ক্লিনচিট দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টই। কাজেই আর কী, কথাটি ফুরালো আর নোটে গাছটি মুড়োলো।

তবু মর্যাদা বলে কিছু একটা বিষয় আছে। যাঁদের আছে তাঁরা এর জ্বালা টের পান। যেমন আইপিএস সঞ্জয় ভাট, যিনি দাঙ্গার সত্য প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, মিথ্যা মামলায় জেলবন্দি হয়ে রয়েছেন। সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদ, যিনি দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায় বিচারের জন্য লড়াই করছিলেন, তাঁকেও মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন এসব নিয়ে ভেবে, এসব করে লাভ কী? শুধু শুধু মার খাওয়া, জেলে যাওয়া ছাড়া? সত্য প্রকাশের জন্য, দেশের দশের মঙ্গলে মার যারা খায়, জেলে যারা যায় সত্যিই কি ভেবে দেখেছি তাদের এই দুর্দশা ঘটে কেন? গভীর রাতে 'নিরপেক্ষতার' 'আত্মাভিমানের' অস্থায়ী পর্দাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উত্তরটা যদি নিজের কাছে বারবার জানতে চাই তবে উত্তর ঠিক আসে। সত্যিই যা স্বাধীন চিন্তা, যে চিন্তা মানুষের মধ্যে অজস্র প্রশ্নের আলো জ্বেলে দেয়, যে চিন্তা মানুষকে কিছু করতে বলে, আমি আপনি সেই চিন্তাকে লালন করিনি। সেই স্বাধীন চিন্তার সামাজিক বিস্তারে কোনও ভূমিকা নিইনি।

তাই অল্পসংখ্যক মানুষ যাঁরা মর্যাদা নিয়ে চলেন তাঁদের এ দুর্গতি। বড় অংশের মানুষকে তাঁরা সাথে পাননি, তাই এ দুর্গতি। মৌলবাদী চিন্তা যা শাসক শ্রেণির হাতে মহা অস্ত্র, বাধাহীনভাবে তা ধারালো হচ্ছে। ক্ষুধা-দারিদ্র-বেকারিত্ব-লাঞ্ছনা-অপমানের বাস্তবতাকে 'উন্নয়ন' 'ত্যাগ' 'কৃচ্ছসাধন' 'দেশপ্রেম' এমন নানা নামের আড়ালে ঢেকে দেওয়া যাচ্ছে। চিন্তাটা আসলে এখানেই। এইখানে এসে বিলকিস বানোরা প্রতিদিন ধর্ষিতা হচ্ছেন, দেশের লক্ষ কোটি সাধারণ মানুষ প্রতিদিন নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যদি একবার সবাই মিলে ওই ভারি কালো পর্দাটাকে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে দিতে পারি, সত্যের আলো এসে ঘুচিয়ে দেবে সব মলিনতার অন্ধকারকে। হাজার হাজার প্রশ্ন এসে ভিড় করে দাঁড়াবে। শত শত বিলকিস সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার চাইবে। দাবি জানাবে, 'আমাদের নির্ভয়ে বাঁচবার অধিকার দিন।' সমাজ বদলের লড়াইয়ে সামিল হয়েই মিলতে পারে সেই অধিকার!

ধুপগুড়িতে মহিলা সম্মেলন

জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতে অল ইন্ডিয়া মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে ৩১ আগস্ট আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সান্ত্বনা দত্ত। কমরেড অনিতা রায় ও কমরেড কল্যাণী রায়কে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করে ১০ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর থানার রাজাপুর-করাবেগ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোডাবর গ্রামের বাসিন্দা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের দৃঢ় সমর্থক ও দরদি কমরেড ডাক্তার জেহেন আলি লস্কর গত ৭ সেপ্টেম্বর নিজ বাসগৃহে ৯৫ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কংগ্রেসী পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ছাত্রাবস্থায় তিনি সিপিআই-এর সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৬৫ সালে ধোসা হাটে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর একটি ভাষণ শোনার পর তিনি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের বইপত্র পড়ে দলের প্রতি আকৃষ্ট হন ও সক্রিয় ভাবে যুক্ত হন। পার্টির বিভিন্ন কর্মসূচিতে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। ডাক্তার জেহেন আলি লস্করের কর্মস্থল ছিল ক্যানিং, কুলতলি, জয়নগর ও বারুইপুর থানার সংযোগস্থল ধোসা হাটে। বহু নেতা-কর্মীর নিয়মিত যোগাযোগের স্থান ছিল তাঁর চেম্বার। '৮০ দশকের প্রথমের দিকে সিপিএমের খুন-সন্ত্রাস-অত্যাচারের কারণে ধোসা হাটে দলের পার্টি অফিস বন্ধকরে দিতে হয়েছিল। দলের নেতা-কর্মীদের ধোসা হাটে যাতায়াত নিরাপদ ছিল না। সেই কঠিন পরিস্থিতিতে ডাক্তার জেহেন আলি লস্কর তাঁর চেম্বারে দলের পতাকা উত্তোলন করে অঘোষিত ভাবে পার্টির কাজকর্ম করতে সাহায্য করেন। এলাকায় চিকিৎসক হিসেবে জনপ্রিয় হওয়ায় সিপিএম কিছু করতে সাহস পায়নি। সেই সময় সিপিএম দুষ্কৃতীরা দলের স্থানীয় নেতা কমরেড নরেশ নস্করকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করলে আহত কমরেড চেম্বারে এসে আশ্রয় নেন এবং ডাঃ জেহেন আলি লস্কর প্রাথমিক চিকিৎসা করে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। সিপিএম দুষ্কৃতীরা তাঁর চেম্বার ভাঙচুর করে। কমরেড লস্কর কঠিন পরিস্থিতিতে একাধিক বার দলের নেতৃত্বে পঞ্চায়েত গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর সন্তান সহ পরিবারের অন্যান্যদের দলের সাথে যুক্ত করে দলের কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। বার্ধক্যজনিত কারণে বাড়িতে থাকা অবস্থায় তিনি নিয়মিত দলের ও নেতা-কর্মীদের খোঁজখবর নিতেন এবং পরামর্শ দিতেন। কমরেড জেহেন আলি লস্করের মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ দৃঢ় সমর্থক ও দরদিকে হারাল।

কমরেড জেহেন আলি লস্কর লাল সেলাম

বিলকিস বানো

বহরমপুরে ধিক্কার সভা

বিলকিস বানো মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত গণধর্ষণকারী ও খুনিদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিবাদে ৩ সেপ্টেম্বর রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে ধিক্কার সভা অনুষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর মোহন মোড়ে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে মোড়ের পাশে একটি ক্লাবঘর থেকে সভা চলে। গুজরাটের বিজেপি সরকারের এই নির্লজ্জ পদক্ষেপের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা স্মৃতিরেখা রায়চৌধুরী, সংগঠনের সভাপতি কাবেরী বিশ্বাস, প্রবীণ সমাজকর্মী মিলন মালাকার, শিক্ষিকা সোনালী গুপ্ত, সুকুমার ব্যানার্জী, উত্তরা প্রামাণিক ও সম্পাদিকা খাদিজা বানু প্রমুখ।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

চিন সমাজতন্ত্রের রূপকার
মহান মাও সে তুং স্মরণ

৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে মহান নেতা মাও সে তুংয়ের স্মরণ দিবসে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং রাজ্য নেতৃবৃন্দ সহ অন্যরা

এআইডিএসও-র কলকাতা জেলা সম্মেলন

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিল, শিক্ষায় পিপিপি মডেল প্রত্যাহার, সমস্ত শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ ও ক্লাসরুম ভিত্তিক পঠনপাঠনের দাবি তুললেন পাঁচ শতাধিক ছাত্রপ্রতিনিধি। ১০ সেপ্টেম্বর কলকাতার আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে এআইডিএসও-র কলকাতা জেলা চতুর্দশ ছাত্র সম্মেলনে শিক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি নিয়ে ছাত্র আন্দোলনের শপথ উচ্চারিত হল আবার। সংগঠনের রক্তপতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক। শহিদ বেদিতে মাল্যদানের পর কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শুভঙ্কর চ্যাটার্জী উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন।

মূল খসড়া প্রস্তাবের উপর বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। শিক্ষায় অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রসারের চক্রান্তের বিরুদ্ধে, মেডিকেল শিক্ষার ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, ছাত্রী ও নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন বিদায়ী জেলা সম্পাদক কমরেড আবু সাঈদ। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সভাপতি কমরেড অজিত পানোয়ার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি কমরেড সামসুল আলম, রাজ্য সম্পাদক কমরেড মনিশঙ্কর পট্টনায়ক। নতুন জেলা কমিটি ও জেলা কাউন্সিলের নাম প্রস্তাব করেন বিদায়ী জেলা সম্পাদক কমরেড আবু সাঈদ। বিদায়ী জেলা সভাপতি কমরেড সুমন দাসের নেতৃত্বে সভা পরিচালনা করে একটি সভাপতিমণ্ডলী। কমরেড পিন্টু দাসকে সভাপতি, কমরেড মিজানুর রহমানকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ২৩ জনের সম্পাদকমণ্ডলী সহ ৬৯ জনের জেলা কমিটি ও ৯৫ জনের জেলা কাউন্সিল নির্বাচিত হয়। শেষে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি সংগঠনের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি তথা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এর কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী। সর্বহারা মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে সম্মেলনের কাজ সমাপ্ত হয়।

প্রশাসনের অপদার্থতাতেই ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত

এস ইউ সি আই (সি)-র কলকাতা জেলা সম্পাদক সুব্রত গৌড়ী ১১ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, গতকাল আরও একজন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু ঘটেছে। শুধু দক্ষিণ কলকাতাতেই এ নিয়ে পাঁচজনের মৃত্যু হল। সারা রাজ্যের সঙ্গে কলকাতাতেও যেভাবে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে তাতে সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ গত বছরের তুলনায় সাতগুণ বৃদ্ধি পেলেও প্রশাসন ও পুরসভার যে তৎপরতা প্রয়োজন ছিল তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ জানিয়েছেন ডেঙ্গু নিয়ে এখনই আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। তাঁর এই মন্তব্য যে বর্তমান পুরসভার চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই প্রতিফলন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই পরিস্থিতিতে আমরা ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে পুরসভাকে উপযুক্ত ভূমিকা নিতে বাধ্য করাতে সর্বত্র সংগঠিত ভাবে সোচ্চার হওয়ার জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। সাথে কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে নিম্নলিখিত দাবিগুলি নিয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা পুরসভায় বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি নিয়েছি।

দাবি ঃ ১) কলকাতা শহর জুড়ে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে প্রশাসনের সক্রিয়তা বহুগুণ বাড়াতে হবে। ভেক্টর কন্ট্রোল বিভাগকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। ২) কলকাতার সর্বত্র লার্ভা নিরোধক স্প্রে, এলাকাভিত্তিক স্প্রে, বাড়ি বাড়ি স্প্রে, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় যেখানে মানুষের মশারি টাঙাবার জায়গা পর্যন্ত থাকে না সেখানে বাড়ি বাড়ি স্প্রে করতে হবে এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের মাধ্যমে নিয়মিত বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদারকি করতে হবে। ৩) পৌর স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু আক্রান্ত সকলের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে। একজন রোগীও যাতে চিকিৎসা বঞ্চিত না হয়, তার জন্য হাসপাতালে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে বেডের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এপিডেমিক এলাকাতে হেলথ ক্যাম্প করতে হবে। সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের, বিশেষত প্লেটলেটের জোগান যাতে ঠিক থাকে তার জন্য কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে রক্তদান শিবির সংগঠিত করতে হবে। ৪) জনসচেতনতা বাড়াবার জন্য নানারকম প্রচারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

বরোগুলিতে ডেপুটেশন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কলকাতা জেলার আঞ্চলিক কমিটিগুলির উদ্যোগে কলকাতার সমস্ত বরোতে ডেপুটেশন দিয়ে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। কলকাতার সর্বত্র লার্ভা নিরোধক স্প্রে, এলাকাভিত্তিক স্প্রে, বাড়ি বাড়ি স্প্রে এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের মাধ্যমে নিয়মিত বাড়ি গিয়ে তদারকির দাবি জানানো হয়। ৫নং বরোতে দলের অভিযোগের ভিত্তিতে পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা দ্রুত এলাকায় উপস্থিত হয়ে জমা জল পরিষ্কারের ব্যবস্থা নেন। ৬নং বরোতে ডেপুটেশনের পর পুরসভা দ্রুত জঞ্জাল পরিষ্কারের ব্যবস্থা নেয়। ৩নং বরোতেও অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত পরিদর্শন করা হয় এবং জঞ্জাল পরিষ্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। দক্ষিণ দমদম পৌরসভাতে ডেপুটেশন দেওয়া হয় (ছবি)।

বাগুইআটিতে ছাত্র খুনের প্রতিবাদে থানায় বিক্ষোভ

বাগুইআটিতে দুই ছাত্রের খুনের ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে ৭ সেপ্টেম্বর বাগুইআটি থানায় দলের রাজারহাট আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড জগন্ময় কর্মকারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল থানায় ডেপুটেশন দেন।

হলফনামাতেও সরকারের মিথ্যাচার

'কোনও মহার্ঘ ভাতা বাকি নেই'—এই মর্মে কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য সরকার যে হলফনামা দিয়েছে, তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন-এর সাধারণ সম্পাদক শুভাশীষ দাস বলেন, বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার রায়দানের পর সরকারি এমন হলফনামা কর্মচারীদের হতবাক করেছে। রাজ্য সরকারের এই ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে সর্বস্তরের কর্মচারী সংগঠন নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনের কথা তিনি তুলে ধরেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com